পৃথিবীর গতি কমে আসার চিহ্ন ধরা পড়ছে ঝিনুকের গায়ে

আমাদের স্কুলের এক বন্ধুর কথা মনে পড়ে, সে যেখানে-সেখানে ঘুমিয়ে পড়ত। তার এই ঘুমের ব্যামোর জন্য মাস্টারমশাইরা বড়ই চিন্তিত ছিলেন। আর তার ছিল শুধু একটাই স্বপ্ন "দিনটা আর একটু লম্বা হয় না কেন রে? বেশ করে ঘুমোতে পারতাম তা হলে।"

তখন প্রাগৈতিহাসিক প্রবাল আর ঝিনুকদের কথা জানতাম না। জানলে বন্ধুটিকে আশ্বাস দিতে পারতাম যে, খুব ধীরে হলেও দিন সত্যিই লম্বা হচ্ছে। যদিও দিন-রাতের দৈর্ঘ্য ২৪ থেকে ২৫ ঘণ্টা হতে আরও ১৮ কোটি বছর লেগে যাবে। আর এর প্রমাণ শুধু ঝিনুক-প্রবালে নয়, চাঁদের কক্ষপথ থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বোধ হয় কথাটা খানিকটা হেঁয়ালি-মার্কা শোনাচ্ছে। ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলা যাক। গল্পটা শুরু করা যাক এডমন্ড হ্যালির সময় থেকে (যিনি হ্যালির ধূমকেতুর জন্য বিখ্যাত)।

তাঁরই প্রথম নজরে পড়ে যে, সূর্য আর চন্দ্রগ্রহণগুলি ঠিক যে সময় হওয়ার কথা তখন ঘটে না। অর্থাৎ গ্রহণের অঙ্কের সঙ্গে গ্রহণের মুহূর্তের কিছুটা তফাত রয়ে যাচ্ছে। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয় যখন সূর্য, চন্দ্র এবং পৃথিবী তাদের কক্ষপথে ঘুরতে-ঘুরতে কখনও একটি সরলরেখায় এসে দাঁড়ায়। এই অঙ্কের সঙ্গে প্রকৃত গ্রহণের মুহূর্তের তফাত কেন হচ্ছে, এই নিয়ে ভাবতে ভাবতে হ্যালি লক্ষ করেন যে, যদি অঙ্কে পৃথিবীর নিজের অক্ষের চারদিকে ঘোরার গতিবেগ ধীরে-ধীরে কমে যায়— অর্থাৎ যদি দিনের দৈর্ঘ্য বাড়ে— তা হলে কোথায় কখন কোন গ্রহণ ঘটবে তার অঙ্কের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ মিলে যায়।

তখন প্রশ্ন উঠল শুধু-শুধু কেনই বা পৃথিবী এমনভাবে ক্লান্ত হয়ে আসবে, আর তার ঘোরার বেগ হ্রাস পাবে? ইমানুয়েল কান্ট, যিনি একদিকে খুব বড় দার্শনিক ছিলেন, আবার বিজ্ঞান নিয়েও ভাবতেন, তিনি অনুমান করলেন যে, হয়তো জোয়ার-ভাটার সময় সাগরের জলের ধাক্কায় পৃথিবীর গতিবেগ কমে আসছে।

আমরা জানি যে, চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রের জল ফুলে ওঠে বলেই জোয়ার আসে। তবে আমরা সাধারণত যা ভুলে যাই তা হল এই যে, চাঁদের এই আকর্ষণে সাড়া দিয়ে পুরোপুরি ফুলে উঠতে সমুদ্রের জল স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা সময় নেয়। এর জন্য দায়ী জলের ঘনত্ব আর সমুদ্রের তলার সঙ্গে জলের ঘর্ষণ।

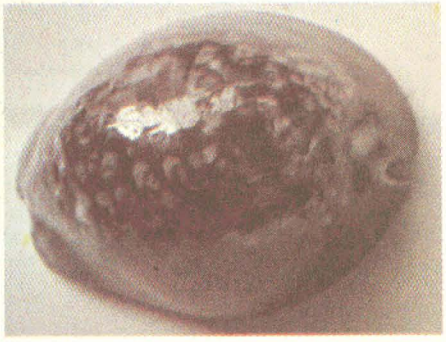

ক্রমেই কমে আসছে পৃথিবীর গতি। একটু-একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে চাঁদ। জানিয়েছেন বিমান নাথ

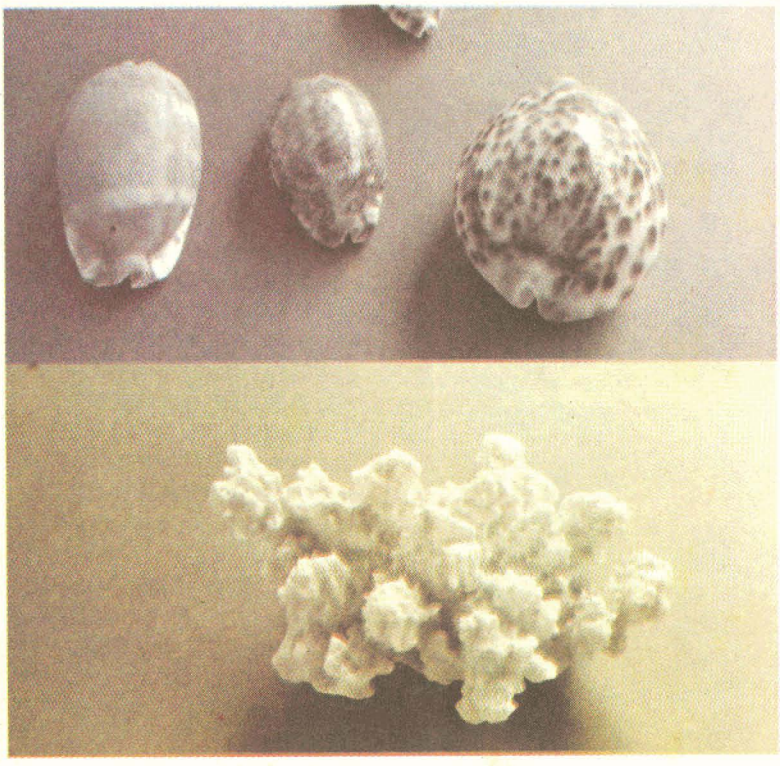

আর ততক্ষণে পৃথিবী তার নিজের চারদিকে কিছুটা ঘুরে যায়। এর ফলে সমুদ্রের জল যখন ফুলে ওঠে, যখন জোয়ার আসে, তখন এই ফুলে ওঠা জলের ওপর চাঁদের আকর্ষণ ঠিক সরলরেখায় হয় না, একটা তির্যক আকর্ষণ দেখা দেয়। এই তেরছা ধরনের আকর্ষণে

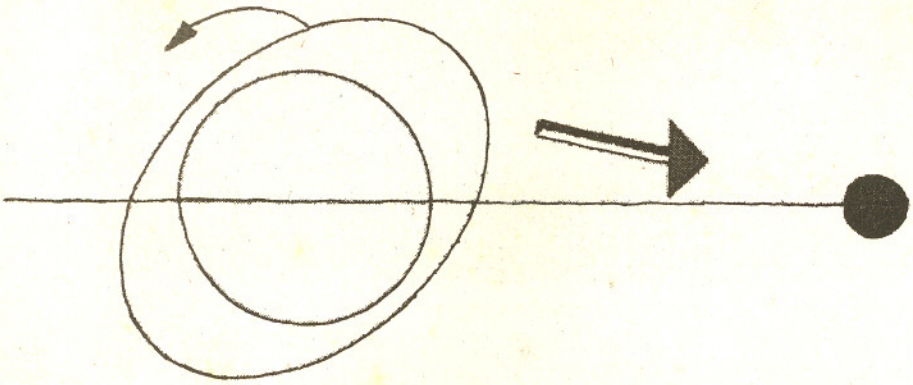

জোয়ার-ভাঁটার সময় পৃথিবীর সমুদ্রের জল চাঁদের আকর্ষণে সাড়া দিতে-দিতে পৃথিবী খানিকটা ঘুরে যায়। তাই সমুদ্রের জলের ওপর চাঁদের একটা তির্যক আকর্ষণ দেখা দেয়, যার ফলে সমুদ্রের জল পৃথিবীকে উলটোদিকে আঘাত করে, এবং তার ঘোরার গতিবেগ কমিয়ে দেয়। ছবিতে অবশ্য বোঝানোর সুবিধের জন্য জোয়ার-ভাঁটা এবং চাঁদের অবস্থানের তারতম্যকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়েছে।

সমুদ্রের জল তখন পৃথিবীর ওপর আছড়ে পড়ে, সে যেদিকে ঘুরছে তার উলটোদিকে আঘাত করে। প্রতিদিনের এই মৃদু আঘাত একটু-একটু করে পৃথিবীর ঘোরার গতিবেগ কমিয়ে দেয়।

হ্যালি এবং কান্টের এই অনুমান পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সত্য প্রমাণ করেছেন। শুধু সূর্য আর চন্দ্রের গ্রহণ নয়, সুদূর নক্ষত্রদের পরিপ্রেক্ষিতে চাঁদের সূক্ষ্ম গতিবিধিতেও এর চিহ্ন দেখা গেছে। এদিকে পৃথিবীর ঘোরার উৎসাহ যত কমছে, ততই চাঁদ পৃথিবীর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এটাও স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটছে। আমরা যখন সুইমিং পুলে ডাইভারদের লক্ষ করি, তখন দেখি যে, তারা যখন হাত-পা গুটিয়ে নেয়, তখন তারা খুব জোরে ঘোরে, আর হাত-পা ছড়িয়ে দিলেই সেই ঘোরার গতিবেগ কমে যায়। ঠিক তেমনই, পৃথিবীর ঘোরার গতিবেগ যত কমছে, তার থেকে চাঁদের দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে। অ্যাস্ট্রোনটরা চাঁদে গিয়ে যেসব যন্ত্রপাতি রেখে এসেছেন, তার সাহায্যে চাঁদের এই দূরে সরে যাওয়া এখন সঠিকভাবে মাপা গেছে। বছরে প্রায় ৩.৮ সেন্টিমিটার বেগে সে আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আর সমুদ্রের জল পৃথিবীর স্থলভাগের ওপর আছড়ে পড়ার জন্য যে শক্তি ক্ষয় হচ্ছে তা যদি কোনওরকমে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা যেত তা হলে তা দিয়ে সমস্ত পৃথিবীর বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো যেত। এর ফলে পৃথিবীর ঘোরার গতিবেগ কমে গিয়ে দিন-রাতের দৈর্ঘ্য এক লক্ষ বছরে প্রায় দু' সেকেণ্ড করে বাড়ছে।

মনে হতে পারে যে, এটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু যদি কয়েকশো কোটি বছরের কথা ভাবা যায়, তা হলে কিন্তু সেকেণ্ড নয়, মিনিট বা ঘণ্টারও তফাত হতে পারে। পৃথিবীর এই ক্রমশ ধীরগতিতে ঘোরার একটা খুব মজার প্রমাণ পাওয়া গেছে প্রাগৈতিহাসিক ঝিনুক আর প্রবালের গায়ে।

সমুদ্রে যেসব প্রবাল-দ্বীপ রয়েছে, সেখানে বিজ্ঞানীরা প্রবালদের গায়ে কিছু উঁচুনিচু অংশ লক্ষ করেছেন। তাঁরা এও লক্ষ করেছেন যে, এই উঁচুনিচু অংশ আসলে প্রবালের হাড়ে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের জমা হওয়ার তারতম্য বোঝায়। যখন জলের তাপমাত্রা খুব কম, তখন তাদের খাদ্যসংগ্রহের উপায়ও কম এবং তাদের গায়ে ক্যালসিয়াম কার্বনেট কম পরিমাণে জমা হয়। তাই এই পরিমাণের কমবেশি হওয়া থেকে ঋতু পরিবর্তন বা পুরো বছরের নানা পরিবর্তনের আন্দাজ পাওয়া যায়। গাছের গুঁড়িতে যেমন প্রতি বছরের জন্য দাগ থাকে।

মজার ব্যাপার হল এই যে, বিজ্ঞানীরা এই উঁচুনিচু অংশের মধ্যেও খুব সূক্ষ্ম কিছু দাগ লক্ষ করেছেন, যা তাঁদের মতে এক-একটি দিনের ক্যালসিয়াম কার্বনেট জমা হওয়ার চিহ্ন। এর কারণ হল,একটি বছরের উঁচুনিচু অংশের মধ্যে প্রায় ৩৬০টি সূক্ষ্ম দাগ রয়েছে, যেটা হল প্রায় একটি বছরে মোট দিনের সংখ্যা। অবশ্য এই সংখ্যায় কখনও কিছু তফাত রয়ে যায়, যার কারণ হয়তো এই যে, মাঝেমধ্যে এই ক্যালসিয়াম কার্বনেট জমা পড়ে না। তবে মোটের ওপর ৩৬০ দাগই দেখা যায়।

তবে এটা হল আধুনিক প্রবালের কথা। বিজ্ঞানীরা এর সঙ্গে অতি প্রাচীন, একেবারে প্রাগৈতিহাসিক প্রবালের গায়ের এই উঁচুনিচু অংশ এবং তার মধ্যে এই সূক্ষ্ম দাগগুলি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, যত পুরনো প্রবাল, তার গায়ে একটি উঁচুনিচু অংশে সূক্ষ্ম দাগের সংখ্যা তত বেশি। অর্থাৎ, অতীতে একটি দিনের সংখ্যা ছিল ৩৬৫-র চেয়ে বেশি। অর্থাৎ, দিন-রাতের দৈর্ঘ্য ছিল কম। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, প্রায় ৪০ কোটি বছর আগেকার প্রবালের জীবাশ্মের ওপর দাগ অনুযায়ী তখন দিনরাতের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ২২ ঘণ্টা।

শুধু প্রবাল নয়, কয়েক ধরনের ঝিনুকের গায়েও প্রতিদিন ক্যালসিয়াম কার্বনেট জমা পড়ে, আর এর মধ্যে পুরো বছরের ঋতু পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা যায়। প্রবালের মতো এই ঝিনুকদের গায়েও প্রতিদিনের সূক্ষ্ম দাগ দেখা যায়। এবং প্রবালের মতোই প্রাগৈতিহাসিক ঝিনুকের গায়েও ছোট দিনের চিহ্ন দেখা গেছে। আর চাঁদের দূরে সরে যাওয়ার অঙ্কের সঙ্গে তা হুবহু মিলে যায়।

বিজ্ঞানের এই অভিনব যোগাযোগের ব্যাপারগুলো সবচেয়ে মজার। কোথায় কোন চিহ্ন কার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে তা প্রথমে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। এর পর কেউ কখনও সমুদ্রের ধারে ঝিনুক কুড়িয়ে পেলে হয়তো তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা পৃথিবীর ঘোরার গল্পের কথা মনে পড়বে। আর চাঁদের সেই চরকাকাটা বুড়ির ক্রমশ দূরে চলে যাওয়ার কথাও।